বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০১৬

INVESTING IN TEENAGE GIRLS

কিশোরীদের জন্য বিনিয়োগ
আগামী প্রজন্মের সুরক্ষা

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রেক্ষাপট

১৯৯০ সালের ১১ জুলাই প্রথমবারের মত পৃথিবীর ৯০টি দেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়। আয়োজন করা হয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক বক্তৃতা, র‍্যালি, সেমিনার ও আলোচনা সভা। রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। আরো ছিল সংবাদ সম্মেলন, চিত্র প্রদর্শনী, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৫/২১৬ নং প্রস্তাব পাসের প্রেক্ষিতে প্রতি বছর ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা পালন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৬

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Investing in Teenage Girls' যার বাংলা ভাবানুবাদ 'কিশোরীদের জন্য বিনিয়োগ আগামী প্রজন্মের সুরক্ষা"। প্রতিটি কিশোরীর নিরাপদ ও সফলতার সাথে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হওয়ার এবং ভবিষ্যতের সকল সম্ভাব্য সুবিধাদি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। UNFPA এই অধিকারসমূহের প্রচারণা, বাস্তবায়ন ও সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। কিশোরীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সহিংসতামুক্ত সকল মানবাধিকারের প্রচারের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকগণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। একই সাথে সামাজিক সংগঠনসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, যুব সংগঠন, সক্রিয়বাদী, বিশ্বাসভিত্তিক সংগঠণগুলো এসব নীতিগুলোকে সঠিকভাবে নির্ধারণ ও বাস্তবতার আলোকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিপাদ্য বিষয়ক প্রধান বার্তা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্য নির্ভর করছে আমরা কিভাবে কিশোরীদের পিছনে সমর্থন ও বিনিয়োগ বজায় রাখতে পারি তার উপর। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ কিশোরীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাসহ তাদের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে এবং পৃথিবীকে বদলে দেয়ার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। বিশ্বের যে সকল দেশ যখনই তাদের যুবগোষ্ঠি বিশেষ করে কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে এবং তাদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করে তখন তা তাদের সুরক্ষা ও সম্ভানাকেই জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে, যা সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্রতা মোকাবেলায় ভূমিকা রাখে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কিশোরী উন্নয়ন :

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থতা। তাই একটি দেশের উন্নয়নের সম্ভাবনাও নির্ভর করে আগামী প্রজন্মের সুস্থভাবে বেড়ে উঠার ওপর। দক্ষ তরুণ জনগোষ্ঠী একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশত এবং এ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাকে সমান গুরুত্ব দেয়ার কথা থাকলেও পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীরা তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং নিগৃহীত। সারাবিশ্বে কিশোরীদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কিশোরদের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়, যা কিশোরী মেয়েদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে

এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। দুর্গম অঞ্চল, নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোরীদের জন্য সমস্যাগুলো আরও প্রকট। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা খুবই জরুরী। কারণ শিক্ষা মানেই অধিক উৎপাদনশীলতা, অধিক উপার্জন। মানসম্মত শিক্ষা একজন মা'কে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলে, যা পরবর্তী সময়ে তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, নারী শিক্ষার সাথে সন্তানদের উত্তম পুষ্টি প্রাপ্যতার সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। শিক্ষিত মায়ের সন্তানেরা কম শিক্ষিত মায়েদের সন্তানদের তুলনায় বেশি পুষ্টি পেয়ে থাকে।

বাল্যবিয়ে-কিশোরী উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধক:

কিশোরী বয়সে বিয়ে, গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় হলেও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে তা খুবই পরিচিত ও আলোচিত বিষয়। প্রতিটি কিশোরীর পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠা এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার অধিকার থাকলেও কিশোরী বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ফলে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি এবং দীর্ঘমেয়াদে অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। বাল্য বিয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে আরও যে বিষয়গুলো আমাদের চিন্তিত করে তোলে সেগুলো হলো: অশিক্ষা, দুর্বল স্বাস্থ্য ও পরাধীনতা। বাল্যবিয়ের ফলে মেয়েদের পড়ালেখার মান কমে যায় এবং তারা ব্যাপকভাবে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। এছাড়াও গর্ভকালীন জটিলতা থেকে তারা মৃত্যুঝুঁকিতে পরে, যা পরবর্তীতে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য সূচকের ন্যায় বাল্যবিয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোতেই বেশি প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাপী ২০ শতাংশ অতি দরিদ্র মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ধনীদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। সারাবিশ্বে ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মৃত্যুর এক নম্বর কারণ আত্মহত্যা ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা।

কিশোরী উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় সহায়তা:

রাষ্ট্রীয়ভাবে সকলের জন্য মানবাধিকার নিশ্চিত করার কথা থাকলেও অনেক দেশ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কিশোরীরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নিগৃহীত না হওয়ার অধিকার থেকে এখনও বঞ্চিত। একজন কিশোরী যখন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নিজের মত প্রদান করতে পারে, নিজের জীবনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা পায় তখন সে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই কিশোরীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রাষ্ট্রকে নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কিশোরী মেয়েদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ক্ষমতায়নের প্রেক্ষাপট তৈরি করলে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যে সকল দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি সে সকল দেশে তরুণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কিশোরীদের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। পিছিয়ে পড়া কিশোরীদের উন্নয়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি ও নিরাপত্তার

বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে না পারলে সত্যিকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি সুদূর পরাহত।

বাল্যবিয়ে-বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম, যেখানে ১০-১৯ বছর বয়সী দেড় কোটিরও বেশি কিশোরী বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স এখনও ১৬.১ বছর। এ দেশে ৫৯ ভাগ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই (বিডিএইচএস-২০১৪) এবং ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মাঝে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হারও খুবই কম (৪৭%)। আবার বিবাহিত কিশোরীদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদাও তুলনামূলকভাবে বেশি (১৭%)। গবেষণায় আরও দেখা যায়, বাল্য বিয়ের ফলে শতকরা ৮৬ জন কিশোরী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং শতকরা ২১ জন কিশোরী অপরিকল্পিতভাবে গর্ভধারণ করে, যার অবধারিত ফল হল মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি, দুর্বল স্বাস্থ্য, অপুষ্টি এবং অনুৎপাদনশীলতা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও সম্ভাবনা :

১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের একটি ক্ষুদ্র দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫২.২৫ মিলিয়ন (বিপিএন্ডএইচসি-২০১১)। এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে ৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৪ হাজার কর্মক্ষম, যাদের মধ্যে ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৭ হাজার পুরুষ এবং ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৭ হাজার নারী। এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তরুণ-তরুণীদের (১৫-২৪ বছর বয়সী) সংখ্যা ২৯% যার মধ্যে তরুণদের সংখ্যা ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৫ হাজার এবং তরুণীদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ৪০% কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি এবং মাত্র ০.১% কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেছে (তথ্য: বিবিএস-২০১২)। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশই হলো কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী যারা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল জনমিতিক সম্ভাবনার (Demographic Window of opportunity) সৃষ্টি করেছে। যদি এই সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীর জন্য সঠিক উন্নয়ন কৌশল, কর্ম-পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় এবং তাদের উপযোগী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তবেই এই জনমিতিক সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারব, যেমনটি হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং ইউরোপে। তরুণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানবউন্নয়ন খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং এই বিনিয়োগের সুফল যাতে কিশোর- কিশোরীরা সমানভাবে পায় সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এ রকম একটি অবস্থায় দক্ষ তরুণ জনগাষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য তরুণদের প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা।

বাংলাদেশে কিশোরী মেয়েদের সার্বিক অবস্থা তাদের নিজেদের, সমাজের এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য এখনও অনুকূল নয়। এমতাবস্থায় জনমিতিক লভ্যাংশ পুরোপুরি অর্জন করতে হলে কিশোরীদের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশকে অধিক পরিমাণে

বিনিয়োগ করতে হবে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার সূচক (Dependency Ratio) ২০১১ এর ৫৫ ভাগ থেকে ৪৫ এ নেমে আসবে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, জনমিতিক লভ্যাংশের এ সুযোগ পরিকল্পনামাফিক কাজে লাগাতে পারলে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত এগিয়ে যাবে। জনমিতিক লভ্যাংশ একটি দেশে একবারই অর্জন করার সুযোগ থাকে এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। উল্লেখ্য জনমিতিক লভ্যাংশের এই সুযোগ আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং পরবর্তীতে আনুপাতিক হারে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমতে থাকবে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ঃ

শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ গ্রহণ উপলক্ষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছেন ঃ

'এক-তৃতীয়াংশ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মানোন্নীত করে সেখানে কৈশোরবান্ধব প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হবে"

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাফল্য ঃ

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে।

- শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছেন।
- মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৪ সালে ছিল ৩.২০ জন , যা ২০১৪ সালে হ্রাস পেয়ে ১.৭০ হয়েছে (তথ্য: State of World Population-2014);
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেবাদানকারীর সহায়তায় শিশুজন্মের হার ২০১১ সালের ৩২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৪২% এ উন্নীত হয়েছে (BDHS-2014);
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ এর ২.৬১% থেকে ২০১১ সালে ১.৩৭%-এ হ্রাস পেয়েছে (আদমশুমারী চূড়ান্ত প্রতিবেদন-২০১১);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫-এর ৭.৭% থেকে ২০১৪ সালে ৬২%-এ উন্নীত হয়েছে (BDHS -2014);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ড্রপ আউটের হার ২০০৪ সালের ৪৯% থেকে ২০১৪ সালে ৩০%-এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2014);

- মোট প্রজনন হার বা নারী প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭৫ সালের ৬.৩ থেকে ২০১৪ সালে ২.৩-এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2014);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৭.৬০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১২ শতাংশ - এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS -2014);
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু ১৯৯১ সালের ৫৬.১ থেকে ২০১২ সালে ৬৯.৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে (BBS -2012)।

কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ :

দীর্ঘ প্রায় ৬ দশকের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্যের কার্যক্রমে অনেক সাফল্য এসেছে। তথাপি ২০১৬ সাল নাগাদ এইচপিএনএসডিপি'র (HPNSDP) লক্ষ্যমাত্রা এবং ভিশন-২০২১ পূরণের পথে এখনও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে :

- বাল্যবিয়ে এখনও একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার আইন থাকলেও ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই (BDHS-2014);
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের ৩১ শতাংশ ১ম অথবা ২য় বারের মতো গর্ভবতী থাকে (BDHS-2014);
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যাবহারের হার ৪৭% মাত্র (BDHS-2014);
- পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের হার মাত্র ৫৪.১ শতাংশ (BDHS-2014);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার (Unmet Need) হার এখনও ১২ শতাংশ (BDHS-2014);
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপ আউটের হার (Drop Out) এখনও ৩০ শতাংশ (BDHS-2014);
- সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, শহর -গ্রাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।
- সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে ৬২ শতাংশ মায়ের প্রসব এখনও বাড়িতে সংগঠিত হয়।
- দুর্গম এলাকার (হাওড়, বাওড়, বিল, চর, উপকূলীয় এলাকা) জনগণের নিকট এখনও পরিবার পরিকল্পনা সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।
- সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে মোট প্রজনন হার অন্যান্য বিভাগের চেয়ে এখনও বেশি।

পরিবার পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

- পরিবার পরিকল্পনা , মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১২,৩৬৯ (বার হাজার তিনশত উনসত্তর) জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা- কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে

চিকিৎসক কর্মকর্তার ৫৩৫টি এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৩৮৬৯টি পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- বর্তমানে ২০,২৬২ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, ৩৬২৯ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ৪৮৮৮ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ২২৫৪ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।
- মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি মাসে ৮টি করে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া ঢাকার আজিমপুরস্থ MCHTI, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), ৪২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মা ও শিশুস্বাস্থ্য ইউনিট এবং ৩,৯২৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) মা ও শিশু এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে ।
- মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে ৯৯২৭ জনকে (পরিবার কল্যাণ সহকারী, নারী স্বাস্থ্য সহকারী, বেসরকারী স্বাস্থ্য কর্মী) CSBA (Community Skilled Birth Attendant) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রী বিদ্যায় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ছয় মাস মেয়াদী মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে ১৬৯৬জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছে। ৩৩৫৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে (UH&FWC) সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা স্বাভাবিক প্রসব (Normal Delivery) সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০১৭ সাল পর্যন্ত সকল প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ৭০ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে প্রদত্ত অংগীকার বাস্তবায়নে ৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এবং ৮৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্ণার তৈরী পূর্বক কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট এবং ইউএনএফপিএর সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য তথ্য সমৃদ্ধ একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে (www.adolescent-mchdgfpbd.org) ।
- ২০০৬ সালে প্রণীত National Adolescent Reproductive Health Strategy এর প্রবিধি সম্প্রসারিত করে National Strategy For Adolescent Health (২০১৬-২০৩০) প্রণয়নের কাজ চলছে।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর দু'বার সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালন করা হয়। সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি

পেয়েছে বিশেষ করে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা। একই সাথে ব্যাপক সেবাদান ও প্রচার স্থানীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আইইএম) ইউনিট থেকে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ, বাল্যবিয়ে রোধ, দু'সন্তানের মাঝে বিরতির সময় বৃদ্ধি, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা, দক্ষ দাই দ্বারা সন্তান প্রসব করানো, গর্ভবতীর সেবা প্রাপ্তির ৩টি বিলম্ব ও ৫টি প্রসবকালীন বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নব-দম্পতি ও একসন্তান বিশিষ্ট দম্পতি এবং যুবক-যুবতীদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় (টিভি ও রেডিও) বিজ্ঞাপন, আরডিসি, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সারাদেশে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পল্লীগান, পথনাটক, বিলবোর্ড স্থাপন করে ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর পপুলেশন সেল থেকে এ বিষয়ে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ঃ

- আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্যবিষয়ক অনলাইন ত্রৈমাসিক পত্রিকা e-Bulletin নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
- এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট এবং পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে Adolescent Health Newsletter নামে একটি Newsletter প্রকাশিত হচ্ছে।
- মাঠকর্মীদের ব্যক্তিগত পারফরমেন্স কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যালোচনা করার জন্য অধিদপ্তরে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি মাঠকর্মীর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
- USAID-এর অর্থায়নে এবং BKMI (Bangladesh Knowledge Management Initiative) এর কারিগরি সহায়তায় আইইএম ইউনিট হতে প্রকাশিত ও নির্মিত বিভিন্ন ধরনের আইইসি উপকরণসমূহ ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলা হয়েছে এবং অনলাইনে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায়: আইইএম ইউনিট,
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।